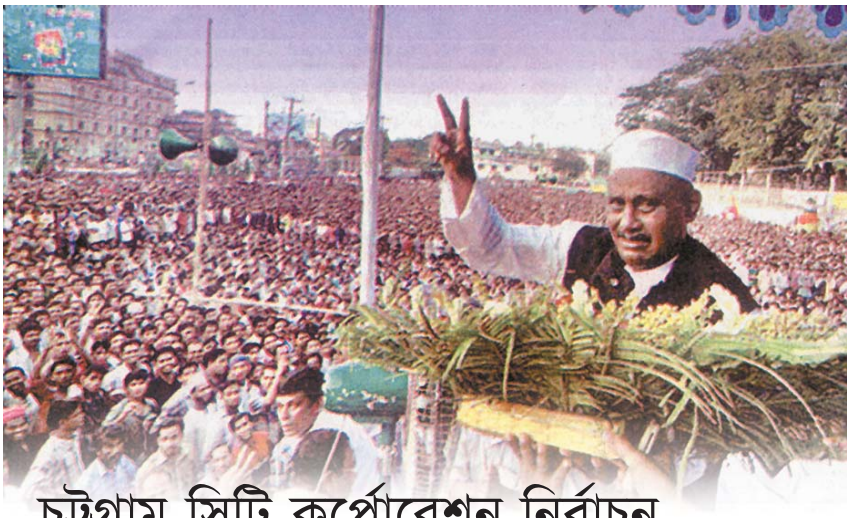

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

রাজনীতির কুশীলবদের জন্য শিক্ষণীয়

অনিরুদ্ধ ইসলাম

ভোট দেয়ার পর ভোট রক্ষা করার জন্য সারারাত ধরে পাহারা দিতে হয়েছে চট্টগ্রামবাসীকে। এর আগে দিনভর চলেছে ভোট নিয়ে চাপান-উতরানোর পালা। মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে ভোট কেন্দ্রে প্রহৃত হয়েছে। মেয়েকে ভোট দিতে বাধা দিয়েছে ছাত্রদলের কর্মীরা। মেয়র মহিউদ্দিন নিজেই ছুটে গেছেন এসব কেন্দ্রে। সবার উত্তেজনা থামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে আবার ভোট চালু করেছেন। মহিউদ্দিন চৌধুরী জানতেন যে নিরাপদে ভোট দিতে পারলে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন। তার এই বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছে। তবুও জোট সরকারের চক্রান্তের শেষ হয়নি। কেন্দ্র থেকে ভোটের ফলাফল এসে পৌঁছানোর পরও তা জানাবার ব্যাপারে শম্বুকনীতি অবলম্বন করেন রিটার্নিং অফিসার। একুশটি কেন্দ্রে ভোটের বেসরকারি ফলাফল জানাবার পরই বন্ধ করে দেন ঐ ফলাফল ঘোষণা। নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে বারবার ফোন করেও চট্টগ্রামের রিটার্নিং অফিস থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। টেলিভিশনে বিষয়গুলো স্পষ্ট দেখা গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছিল লা-পরোয়া। কিন্তু ততক্ষণে চট্টগ্রামের রিটার্নিং অফিস ঘিরে জনগণের প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই অপেক্ষমাণ জনগণ জেনে গেছে তাদের হাতে পাওয়া ফলাফলে মহিউদ্দিন চৌধুরী বিপুল ভোটেই এগিয়ে আছেন সমস্ত কেন্দ্রে। কিন্তু ফলাফল ঘোষণা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন 'মিডিয়া ক্যু' হতে যাচ্ছে কিনা। উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে এক পর্যায়ে অপেক্ষমাণ জনতার একটি অংশ মন্ত্রীদের থাকার জায়গা সার্কিট হাউস আক্রমণ করে বসে। মহিউদ্দিন চৌধুরী অবশ্য সবার সঙ্গে রাতভর জেগে অপেক্ষা করে উত্তেজনা থামিয়েছেন। ভোরের আলো না ফুটতেই বিজয়ের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতাসহ সমস্ত চট্টগ্রাম খুশিতে ফেটে পড়েছে। জনতার অভিনন্দনের জবাবে মেয়র মহিউদ্দিন বলেছেন এই বিজয় চট্টগ্রামবাসীর।

সত্যিই চট্টগ্রামবাসীর বিজয় হয়েছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে। সিটি কর্পোরেশনের আদল পাল্টে দিয়ে মেয়র মহিউদ্দিন সেই চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে যে আস্থা ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছেন তার ভিত্তিতে চট্টগ্রামবাসী একাট্টা হয়ে তাদের ভোটের ফলাফল ছিনতাই হতে দেয়নি।

এর আগেও দু'দফায় মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মহিউদ্দিন চৌধুরী। জোটপ্রার্থী মীর নাছিরও মেয়র ছিলেন। অবশ্য অনির্বাচিত। মহিউদ্দিনের কাছে হেরে রাষ্ট্রদূতের পদ নিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মেয়র হিসেবে দু'জনের কার্যক্রমকে বিবেচনা করতে পেরেছে ভোটাররা। এমনিতেই এ দেশের স্থানীয় সরকারগুলোর কোনো স্বাধীনতা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে। সিটি কর্পোরেশন হিসেবে মহিউদ্দিনকে দলীয় সরকারের যেমন, বর্তমান সরকারেরও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন কাজে বাধা মোকাবেলা করে এগুতে হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনকে সত্যিকার অর্থেই জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারকে নানা প্রকার প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে তার জন্য বসে থাকেননি তিনি। কর্পোরেশনের সীমিত সম্পদের ভিত্তিতে আয়বর্ধনকারী কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। একই সঙ্গে হাতে নিয়েছেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা। মহিউদ্দিনের মেয়র মেয়াদকালে চট্টগ্রাম কর্পোরেশনের অধীনে যেমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে, তেমনি গড়ে উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, হজ ও তীর্থ কাফেলা, শব সৎকারের ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও বিনোদনের ব্যবস্থা। রাস্তার যানজট কমানো হয়েছে। নগরকে পরিষ্কার রাখার জন্য ভোরে পরিচ্ছন্নতাকর্মী দিয়ে নগর সাফ করানো হয়েছে। কোনো কোনো সময় মহিউদ্দিন নিজেই পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের হাত থেকে ঝাড়ু তুলে নিয়েছেন।

কিন্তু এসব করতে মেয়র মহিউদ্দিন বুঝে নিয়েছিলেন সিটি কর্পোরেশনের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করা কত কঠিন। দেশের বাণিজ্য রাজধানী চট্টগ্রাম কেবল নামেই, কাজে নয়। তাই মহিউদ্দিন চট্টগ্রামের সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, শ্রেণী-পেশার সংগঠনকে সমবেত করে চল্লিশ দফা দাবিতে গড়ে তুলেছিলেন নাগরিক কমিটি। আওয়ামী লীগের পরিচয় থাকার পরও মেয়র মহিউদ্দিন নির্বাচন করেছেন নাগরিক কমিটির প্রার্থী হিসেবে। এতে তার নির্বাচনের আবেদন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পদক্ষেপের আগেই চট্টগ্রাম পর্যায়ে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য গড়ে উঠেছে। তিনি ঐ ঐক্য গড়েই ক্ষান্ত হননি, জাতীয় পর্যায়ের জোট সরকার বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি চট্টগ্রামের চল্লিশ দফা দাবিতে প্রচার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। স্থানীয় দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচির পাশাপাশি নাগরিক কমিটির ব্যানারে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য চট্টগ্রামের নির্বাচনী ফলাফলে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদই চট্টগ্রামে কেবল দৃঢ় থাবা গেড়ে বসেইনি ঐ

রাজনীতির ছত্র ছায়ায় সেখানে এক শক্তিশালী অপরাধচক্র গড়ে তুলেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগ তো বটেই, এগারোদলের শরিকদলসমূহ জাসদ, ন্যাপ (মোঃ) মেয়র মহিউদ্দিনের প্রার্থিতাকে সরাসরি সমর্থন দিয়েছে।

অবশ্য চট্টগ্রামবাসীর কাছে এই নির্বাচন কোনো প্রহসন ছিল না, তাদের জীবন মরণের প্রশ্ন ছিল। নাগরিক সুবিধার প্রশ্ন বাদ দিয়েও জামায়াতের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী যে চক্র চট্টগ্রামের রাজনীতি ও সমাজকে প্রায় জিম্মি করে ফেলেছে তাদের সম্পূর্ণ পরাজিত করতে না পারলেও, পিছু হটাতে এই নির্বাচনের বিজয় বিশেষ জরুরি ছিল।

বিজয়ী মহিউদ্দিন ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিপরীতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ক্ষমতাসীন চারদলের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীয় নির্বাচনের পনেরো মাস আগে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন জোট সরকার সম্পর্কে দেশবাসীর ভাবনার প্রতিফলন ঘটাবে। তাছাড়া জোট সরকারের অপসারণের দাবিতে বিরোধীদলের যে আন্দোলন চলছে তাতে চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সরকার বিরোধী আন্দোলনে মেয়র মহিউদ্দিন সব সময় বিএনপি'র মাথা ব্যথা হয়ে থেকেছে। '৯৬-এর পনেরোই ফেব্রুয়ারির বিতর্কীত নির্বাচনের পর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জ্বলে উঠেছিল। মহিউদ্দিন তখন সদ্য বিএনপি প্রার্থীকে পরাজিত করে মেয়র হয়েছেন। আর এখন দশ বছরের মেয়র পদ তাকে চট্টগ্রামের একছত্র নেতা বানিয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির হাতে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব থাকলে সেটা বিরোধী আন্দোলন মোকাবেলায় জোটের জন্য বড় অসুবিধার কারণ। সুতরাং জোট সরকার যে কোনো মূল্যে মহিউদ্দিনকে মেয়র পদ থেকে সরাতে চেয়েছে।

জোট সরকারের সঙ্গে সৌদি-পাকিস্তান লবি ছিল। ছিল মার্কিন দূতাবাস। এরা সবাই চেয়েছে মেয়র মহিউদ্দিন সরে যাক।

ঐ সৌদি-পাকিস্তান লবির প্রার্থী ছিলেন মীর নাছির। চট্টগ্রাম বিএনপিতে খালেদা জিয়ার আশীর্বাদ ছাড়া তার বিশেষ অবস্থান না থাকলেও তাকেই মনোনয়ন দিয়েছে চারদলের জোট। এ ব্যাপারে জোটের শরিক জামায়াতের ভূমিকা ছিল নির্ধারকের। জামায়াত গত বছরগুলোতে চট্টগ্রামে তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবেই বিএনপি জামায়াতের আদর্শিক নিয়ন্ত্রণে। সাংগঠনিকভাবেও জামায়াত বিএনপির সঙ্গে টক্কর লড়ে। চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে জামায়াতের প্রভাব এতই নিরঙ্কুশ যে জামায়াত বিরোধী বলে পরিচিত বিএনপি নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান প্রায় চট্টগ্রাম ছাড়া। বিএনপি'র সাবেক মন্ত্রী জামায়াতের বিরোধিতা করতে গিয়ে দলে কোণঠাসা, চট্টগ্রাম রাজনীতিতে তো বটেই।

djvdj †NvlYvq Mvogvmi Kvi‡Y nvRvi nvRvi RbMYmn gnDwÏb †PŠaix iv‡Z PÆMÖvg †Rjv wRg‡bwmqv‡g wbevPb wbqšY K‡¶i mvg‡b Ae¯vb †bb

প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সাকা চৌধুরী তাদের বিশেষ সহায়।

খাতায়-কলমে বিএনপির সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী মীর নাছিরের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট থাকলেও জামায়াতের শাহজাহান চৌধুরীই নাছিরের নির্বাচনী প্রচারকাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তার আপত্তির কারণেই তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভায় কর্নেল অলি আহমদের জায়গা হয়নি। শেষে তারেক রহমান তাকে ডেকে মঞ্চে জায়গা দেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দিন কর্নেল অলি অবসর সময় কাটিয়েছেন তার এলাকায়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি নেতা মীর নাছির মূলত জামায়াতেরই প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে পরাজয়ের পর চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা দস্তগীর চৌধুরী প্রকাশ্যেই বলেন যে, মীর নাছির বিএনপি না জামায়াতের প্রার্থী এটা বুঝতে বুঝতেই দিন পার হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের বিএনপির নেতা-কর্মী, নির্বাচন পরিচালনায় যারা বাইরে থেকে এসেছিলেন সবারই বক্তব্য তাই। বিএনপির ছাত্রদল ছাত্রশিবিরের কাছে এতই কোণঠাসা ছিল যে নির্বাচনে তাদের কথা শোনাই যায়নি। বস্তুত চট্টগ্রাম মেয়র পদে মীর নাছিরের নির্বাচন ছিল বিএনপির বনাম জামায়াতে শক্তির প্রদর্শন। তারা এই নির্বাচনে তাদের এই শক্তি প্রদর্শন করে জাতীয় নির্বাচনেও একই অবস্থায় চলে যেতে চেয়েছিল, যাতে বিএনপির সঙ্গে সিট বার্গেনিং ও অন্যান্য নির্বাচনী বিষয়ে তারা সুবিধাজনক স্থান পায়। সে কারণেই জামায়াত চট্টগ্রাম নির্বাচনে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তারা দাবি করেছিল যে তাদের এক লাখ রিজার্ভ ভোট নাছিরকে অবশ্যই জিতিয়ে আনবে। বেগম জিয়া এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন বলে চট্টগ্রাম নির্বাচনে জামায়াতের পছন্দের প্রার্থী নাছিরকে মনোনয়ন দিয়েছেন। এ ব্যাপারে চট্টগ্রামের দল বা চট্টগ্রামবাসীর মনোভাব তিনি জানতে চাননি। বিএনপির অন্য নেতারাও খালেদা জিয়া ও জামায়াতের বিরাগভাজন হবেন বলে নাছিরকেই বিনা প্রতিবাদে মেয়র প্রার্থী হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে বিএনপি প্রার্থীর এই জামায়াত-নির্ভরতা ব্যুমেরাং হয়েছে। নির্বাচনে জামায়াতের এলাকাগুলোতেও নাছির জিততে পারেনি। অন্যদিকে বিএনপির ভোটাররা তাদের পেছন থেকে সরে গেছে।

এ ব্যাপারে অবশ্য জামায়াত ও বিএনপির নেতারা মহিউদ্দিনের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু মেয়র পদে সেটা না হয় সত্য হলো, কিন্তু কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও জামায়াত ভোট টানতে পারেনি। তাদের মাত্র একজন কমিশনার নির্বাচিত হয়েছে। সেই হিসেবে বলা যায় যে, সম্পূর্ণ রাজনীতির ভিত্তিতেই চট্টগ্রামের নির্বাচন হয়েছে। চট্টগ্রামের জনগণ জামায়াতের বাড়াবাড়ি একেবারেই পছন্দ করেনি। অন্যদিকে বিএনপি বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের সব কটি আসনে জয়লাভ করলেও, এখন তাদের ভোটের ভান্ডারে টান ধরেছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির মন্ত্রী, সাংসদ সবাই উপস্থিত থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছে। শেষ পর্যায়ে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান নিজে মাঠে নেমেছিলেন। তার নির্বাচনী প্রচারণা ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে বলে অনেকে মনে করেছিল। তারেক রহমান তার নির্বাচনী প্রচারে মীর নাছির নয়, বিএনপির ধানের শীষ ও তার প্রয়াত পিতা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পক্ষে একবারের জন্য মীর নাছিরকে ভোট দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। চট্টগ্রামবাসী তার আবেদনে কোনো সাড়া দেয়নি।

এদিকে চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের হিসাব-নিকাশকেও গুলিয়ে দিয়েছে। গত নির্বাচনগুলোর ফলাফল বিচার করে সাধারণভাবে এটা বলা হয় যে বিএনপি ও

জামায়াতের ভোটের যোগফল তাদের বিজয়কে নিশ্চিত করে। আর এ কারণেই বিএনপির পক্ষে জামায়াতকে ছাড়া সম্ভব নয়। আর এর সঙ্গে এরশাদের জাতীয় পার্টির ভোট যুক্ত হলে চার দলের বিজয়কে ঠেকানোর কোনোই কায়দা নেই। এরশাদ নিজে এটা মনে করেন বলে দরকষাকষি করছেন যে, তাকে বাদ দিয়ে কেউ সরকার গঠন করতে পারবে না এবং এখনও তার সমর্থনটা বিএনপির দিকেই রেখেছেন যেটা আওয়ামী লীগকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে এবং আওয়ামী লীগের তরফ থেকে তাকে পক্ষে টানার কোসেসের কমতি নেই। আওয়ামী লীগ এখনও আশা করে যে এখন যে ভূমিকাই নিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসলেই এরশাদকে তাদের পক্ষে নেয়া যাবে। আর এভাবে গড়ে ওঠা মহাজোট নির্বাচনের বিজয়কে নিশ্চিত করবে।

কিন্তু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বলছে ভিন্ন কথা। নির্বাচনের অঙ্কের হিসাবে '৯৪-তে মীর নাছির ১৭ হাজার ভোটে মহিউদ্দিনের কাছে পরাজয়বরণ করেছিলেন। সে সময় জামায়াতও প্রার্থী দিয়েছিল। তারা ভোট পেয়েছিল ২৮ হাজার। জামায়াত এখন দাবি করছে যে তাদের ভোট এক লাখ। পক্ষান্তরে বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত আসনসমূহে আওয়ামী লীগ থেকে ৭০ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল। তাহলে নির্বাচনে কেবল জামায়াতের ভোট দিয়েই মহিউদ্দিনের সঙ্গে গ্যাপ পূরণ করে বিজয় লাভ করতে পারতেন। আর সব ভোট মিলিয়ে তার বিপুল ভোটে জয়লাভ করার কথা। সেখানে মহিউদ্দিন চৌধুরী একানব্বই হাজার ভোটে জিতলেন। আওয়ামী লীগ বাদে নাগরিক কমিটিতে যেসব দল ছিল তারা ভোটের হিসাবে খুবই নগণ্য। এটা যদি ধরেই নেয়া হয় যে, মহিউদ্দিনের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই তাকে এত ভোটে জিতিয়েছে, তাহলে কমিশনার পদে বিএনপি বা জামায়াত জিতল না কেন। মহিউদ্দিন চৌধুরীও কমিশনারদের নির্বাচনে কারও পক্ষ নেননি। তাছাড়া কমিশনার পদে আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থীও ছিল। সেই হিসেবে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণে মহিউদ্দিন চৌধুরীকে যদি তার ঐ লিডের অর্ধেকের বেশিও দেয় তারপরও বাকি ভোট কিভাবে পড়ল। এখানেই রাজনীতির প্রশ্নটি আসে। চট্টগ্রাম নির্বাচনে নাগরিক কমিটিতে সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি এক হয়েছিল। তারা বেশ আগ থেকেই চল্লিশ দফা স্থানীয় দাবিতে আন্দোলন করেছিল। জাতীয় পর্যায়ে এই নাগরিক কমিটির সংশ্লিষ্ট দলরাই আন্দোলনের ঐক্যে উপনীত হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোটের বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক শক্তির এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান চট্টগ্রাম নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তো বটেই, মহিউদ্দিনের জন্য নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন গণফোরাম নেতা ড. কামাল হোসেন, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন ও ফজলে হোসেন বাদশা, জাসদ নেতৃবৃন্দ। এরই যোগফল নয়, গুণফল ঘটেছে চট্টগ্রাম নির্বাচনে।

অন্যদিকে নির্বাচনে এরশাদ ফ্যাক্টরও কোনো কাজে লাগেনি। এরশাদ প্রথমে প্রার্থী দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম নির্বাচনে। পরে ঐ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এরশাদের লোকেরা নাছিরের নির্বাচন করেছে। এরশাদের ছবি দিয়ে নাছিরের নির্বাচনী পোস্টার হয়েছে। কিন্তু ভোটের যোগফল শূন্য না কেবল, নেগেটিভ।

অন্যান্য ইসলামী শক্তিরও তাই। চট্টগ্রাম মেয়র নির্বাচনকালেই খতমে নবুওয়তআলারা কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করার কর্মসূচি নেয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে মহিউদ্দিনকেও কাদিয়ানিদের পক্ষাবলম্বনকারী বলে চিহ্নিত করে তারা। ঈদে মিলাদুন্নবীতে জশ্নে জলুস দিয়ে শো-ডাউনও করেছে এই শক্তিগুলো। কিন্তু ঐসব ধর্মীয় মিছিলে যারা যোগ দিয়েছে তারাই আবার হাত খুলে মহিউদ্দিনকে ভোট দিয়েছে। মহিউদ্দিন নিজে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। হজ করে এসে মাথায় সর্বক্ষণ টুপি রাখেন। কিন্তু ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাননি। ধর্মের ব্যাপারেও নিরপেক্ষ। মেয়র হজ কাফেলায় হজ করেছে চট্টগ্রামের লোক। তীর্থ যাত্রারও ব্যবস্থা করেছেন তিনি। ধর্মের রাজনীতি তার কাছে পরাজয়বরণ করেছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জনগণ শেষ পর্যন্ত তাদের ভোট রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর তাদের আস্থা কোন পর্যায়ে, সারা রাত ধরে নির্বাচনী অফিস ঘিরে রাখার ঘটনাই তার প্রমাণ। নির্বাচনী পর্যবেক্ষণকারী সংগঠন জানিপপ বলেছে যে 'মিডিয়া ক্যু' হয়ে যেতে পারত। মানুষেরও তাই ধারণা। ঢাকায় নির্বাচন কমিশন অফিস ছিল একেবারেই অসহায়। নির্বাচন কমিশন থেকে রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে কল চেয়ে বারবার টেলিফোনে তাগিদ দেয়ার পরও দীর্ঘ দুই ঘন্টা তারা কোনো উত্তর পায়নি। ঐ সময় ভোটের ফলাফল ঘোষণাও স্থগিত ছিল। কি কারণে সেটা স্থগিত করা হয়েছিল রিটার্নিং অফিসার তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। সম্ভবত তিনি উপরমহলের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত চট্টগ্রামবাসী রাতের ঘুম ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছে যে, ফল ঘোষণায় বিলম্ব পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার ঐ ফল ঘোষণা শুরু করেন।

নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগেও আয়া, পিয়ন, লস্কর, এমনকি পাগলও নিয়োগ করা হয়। সংবাদপত্রের সমালোচনার জবাবে রিটার্নিং অফিসারের বক্তব্য ছিল, এগারো হাজার কর্মকর্তার মধ্যে দু'একজন পাগল থাকতেই পারে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সেটা মানতে রাজি হয়নি। ঐসব কর্মকর্তা পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু রিটার্নিং অফিসারকে ভর্ৎসনা করা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না।

নির্বাচনে টাকার খেলা, সাম্প্রদায়িক প্রচার সবই হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এসব বিষয় চেয়ে চেয়ে দেখেছে। বিদায়ের প্রাক্কালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ সাঈদ বলেছেন, নির্বাচন সংস্কারের যে দাবি উঠেছে তার যুক্তি আছে। তিনি নিজেও সবার আগে সরকারের কাছে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাঠিয়ে যাবেন। গত পাঁচ বছরই নাকি এ নিয়ে তিনি ভেবেছেন এবং ভেবে ভেবেই পাঁচ বছর পার করে দিয়েছেন। তবে চট্টগ্রামের নির্বাচনের ঘটনাবলী আবার প্রমাণ করেছে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার ও নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দাবি কতখানি প্রাসঙ্গিক। জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে।

এসব মিলিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেই বিবেচিত হবে। বিএনপির মহাসচিব একে স্থানীয় নির্বাচন বলে জাতীয় রাজনীতি ও নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে না বলে দাবি করলেও, এই নির্বাচন কেবল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহীই নয়, রাজনীতির কুশীলব সকল পক্ষের জন্যই শিক্ষণীয়। তারা এর থেকে শিক্ষা নেবেন কিনা সেটা তাদের ব্যাপার। তবে চট্টগ্রামবাসী এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস স্থাপন করলেন সেটা সবার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ছবি : **প্রথম আলো'র সৌজন্যে**

জনগণ শেষ পর্যন্ত তাদের ভোট রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর তাদের আস্থা কোন পর্যায়ে, সারা রাত ধরে নির্বাচনী অফিস ঘিরে রাখার ঘটনাই তার প্রমাণ। নির্বাচনী পর্যবেক্ষণকারী সংগঠন জানিপপ বলেছে যে 'মিডিয়া ক্যু' হয়ে যেতে পারত